Vol. 49 | No. 2 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার প্রথম পর্যায় : একটি পর্যবেক্ষণ

Volume	49
Issue	2
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Masuda Khatun Jui
Published online	March 1, 2025
DOI	10.62328/sp.v49i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i2.9
Pages	161-174
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার প্রথম পর্যায় : একটি পর্যবেক্ষণ

Check for updates

মাসুদা খাতুন জুঁই*

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা চর্চার শুরু বিশ শতকের চল্লিশের দশকে জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬), কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮), সফিউদ্দীন আহমেদ (জন্ম-১৯২২), এস.এম. সুলতানের (১৯২৩-১৯৯৪) হাত ধরে। এ চার শিল্পী চিত্রকলার যে ভাষা নির্মাণ করেছিলেন তার স্বরূপ এবং তাৎপর্য কী, কোন উত্তরাধিকার তারা লাভ করেছিলেন, তাদের নির্মিত ধারা কারা কীভাবে বহন করেছে — এ প্রশ্নগুলোর উত্তর বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা চর্চার প্রথম পর্যায়কে চিহ্নিত করে। সামগ্রিকভাবে এই প্রথম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল সংস্কৃতিগত পরিচয় নির্মাণের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা ছিল জাতি-রাষ্ট্র গঠনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে জাতি-রাষ্ট্র গঠনের শুরু, যার পরিণতি ১৯৪৭এর দেশবিভাগ এবং পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠন।

ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক চিত্রকলা চর্চার শুরু হয়েছিল মূলত পাশ্চাত্য চিত্রভাষার (স্বভাববাদী রীতি) বিপরীতে একটি নিজস্ব চিত্রভাষা নির্মাণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলন ছিল এই প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ। এখানে স্বদেশভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নতুন শৈলী নির্মাণ প্রচেষ্টা। এই স্বদেশভাবনার উৎস ছিল সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, প্রাচ্যবাদী ভাবনা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা। পরবর্তীকালে এই স্বদেশভাবনার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছিল বিশ্বভাবনা, সমকালীনতা এবং আঙ্গিকের নিরীক্ষাধর্মিতা।

এরকম একটি পরিপ্রেক্ষিতকে পেছনে রেখেই আবির্ভাব জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ ও এস.এম. সুলতানের। সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জনের পর এ শিল্পীরাই অগ্রপথিক হয়েছিলেন বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা চর্চার। আঙ্গিকের নিরীক্ষাধর্মিতা, পাশ্চাত্য রীতির সঙ্গে লোককলা, লোকজীবন এবং স্বাজাত্যবোধের সংমিশ্রণে নতুন ভাষা নির্মাণ প্রচেষ্টা — এ সবই ছিল এদের শিল্পের বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতিগত এবং জাতিগতভাবে আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রচেষ্টার একটি বলিষ্ঠ ধারা তৈরী হয়েছে এ অগ্রপথিকদের ছবির মধ্য দিয়ে। এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ধারাটির স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

ইংরেজরা ভারতীয় উপমহাদেশে আসার পর তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ছবি আঁকার ক্ষেত্রে পশ্চিমা স্বভাববাদী রীতির ব্যাপক প্রচলন ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে স্বাজাত্য ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) একটি শিল্প আন্দোলনের জন্ম দিয়ে ভারতীয় আধুনিক শিল্পের পথ প্রদর্শক হিসেবে আবির্ভূত হন। 'Abanindranath was the first Indian artist to openly commit himself to a

---

* খণ্ডকালীন প্রভাষক, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

culture-specific modernism' (শিবকুমার, ২০০২ : ৯) । এভাবেই আর. শিবকুমার অবনীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করেছেন। ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে স্বাজাত্যভাবনা মিশ্রিত নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়বাহী একটি আধুনিক চিত্ররূপ রচনার প্রয়াস ছিল অবনীন্দ্রনাথের। তাঁর এ রূপ ভাবনায় ইউরোপীয়, জাপানী ও ভারতীয় এ তিন চিত্রভাষার করণকৌশলের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তাঁর শিল্পশিক্ষার শুরু ১৮৯১ সালে ইউরোপীয় শিল্প শিক্ষকের কাছে। এসময় থেকেই ছবি আঁকায় তাঁকে উৎসাহিত করেন তাঁর কাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। (মৃণাল, ২০০৫ : ১৩৫)। পাশ্চাত্য রীতি অবনীন্দ্রনাথ ভালোভাবে আয়ত্ত করলেও তাঁর মধ্যে নতুন চিত্রভাষা নির্মাণের অন্বেষা চলছিল, যার অনুসন্ধান তিনি পান ইংরেজি বই চিত্রণ রীতির ঐতিহ্যে করা টমাস মুরের আইরিশ মেলডির সচিত্রিত প্রতিলিপি (পার্থ, ১৯৯৪ : ২৭৭) এবং দিল্লি কলামের মিনিয়েচার থেকে (এলা, ২০০২ : ২২) । এই দুই ধারার ছবি অবনীন্দ্রনাথের মনে এক নতুন প্রেরণা জাগায়। তাঁর ভাষায় :

> সেই আইরিশ মেলডির ছবি ও দিল্লীর ইন্দ্রসভার নকশা যেন আমার চোখ খুলে দিল। একদিকে আমার পুরাতন ইউরোপীয়ান আর্টের নিদর্শন ও আর একদিক এদেশের পুরাতন চিত্রের নিদর্শন। দুই দিকের এই পুরাতন চিত্রকলার গোড়াকার কথা একই ... যাক, ভারত শিল্পের তো একটা উদ্দিশ পেলুম। এখন শুরু করা যাবে কী করে কাজ? ... রবি কাকা আমায় বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে। রবিকাকা আমাকে এই পর্যন্ত বাৎলে দিলেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৯৮৫ : ৩০৪-৩০৫)

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তিনি প্রথম *শুক্লাভিসার* (গোবিন্দদাসের কবিতা অবলম্বনে) ছবিটি আঁকেন। এই *কৃষ্ণমালা* চিত্র (১৮৯৫-৯৭) দেশজ ভাবনাসমৃদ্ধ ছবি আঁকার প্রথম নিদর্শন। ১৮৯৭ সালে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই.বি. হ্যাভেলের (১৮৬১-১৯৩৪) সঙ্গে পরিচয় তাঁর এই ভাবনাকে আরো দৃঢ় করে। হ্যাভেলের মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথ মোগল ও রাজপুত অনুচিত্রের সমৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত হন। তাঁর ছবিতে এই রীতিগুলির প্রভাব পড়তে থাকে (মৃণাল, ২০০৫ : ৩৫) ।

অবনীন্দ্রনাথের ছবির পরবর্তী পরিবর্তন যার প্রভাবে ঘটেছে তিনি হলেন জাপানি মনীষী কাকুজো ওকাকুরা তেনশিন (১৮৬৩-১৯১৩)। ১৯০১ সালে ওকাকুরা কলকাতায় আসেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। স্বামীজি তাকে পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে। এখানেই গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে ওকাকুরার (চণ্ডী, ২০০৪ : ১৯)। ওকাকুরা ভারতে এসে *আইডিয়াল অব দি ইস্ট* নামে একটা বই লেখেন। এতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পদানত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুক্তির কথা বলা হয়েছিল (সুপ্রকাশ, ১৯৮৩ : ৬৪)। প্রথমবার ভারত ভ্রমণের পর দেশে ফিরে গিয়ে ওকাকুরা ইয়োকোইয়ামা তাইকান (১৮৬৮-১৯৫৮) ও হিসিদা শুনসো (১৮৭৪-১৯১১) নামে দুই জাপানি শিল্পীকে ১৯০৩ সালে এদেশে পাঠান । এ শিল্পীরা ঠাকুর বাড়িতে কিছুদিন চিত্রচর্চা করেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছ থেকেই জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ছিল ছবির ভেতর সূক্ষ্ম ভাবের ব্যঞ্জনা আনার। ছবির উপরের স্তরের রংকে পানিতে ধুয়ে শুকিয়ে আবার রং প্রয়োগ করলে রং কাগজের গভীরে শোষিত হয় এবং এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিতে ছবিতে গভীরতার এক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয় (মৃণাল, ২০০৫ : ১৩৮)। এভাবে অবনীন্দ্রনাথের

ছবি জাপানি শিল্পীর প্রভাবে আর একটি মোড় নিল এবং ওকাকুরার সর্ব-এশীয় (Pan-Asian) নন্দনতত্ত্বকে জাপানিজ ও ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তুলল।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়েই চিত্রশিল্পের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ ঘটে। দৃঢ় রাজনৈতিক বক্তব্য সংবলিত অবনীন্দ্রনাথের *ভারতমাতা* ছবিটি স্বদেশী আন্দোলনের অস্থির সময়েই নির্মিত হয় (পার্থ, ১৯৯৪ : ২৩৫)। নব্যবঙ্গীয় বা নব্য ভারতীয় চিত্রধারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল না হলেও এ আন্দোলনের সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক ছিল (মৃণাল, ২০০৮ : ৯৫)। অবনীন্দ্রনাথের এই নব্যবঙ্গীয় শিল্পচর্চা সাম্প্রদায়িকতা, অতীত চেতনা এবং পুনরাবৃত্তির আবর্তে পড়ে একটা সময়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অবনীন্দ্রনাথ যখন এই রীতির সূচনা করেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই রীতির সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের জন্য নানা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ১৯১৯ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে কলাভবন প্রতিষ্ঠা করেন ।

ঔপনিবেশিকতার প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয়া দেশজভাবনা সংবলিত নব্যবঙ্গীয় শিল্পকলা ছিল বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চেতনায় আচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ছিল সংকীর্ণতামুক্ত স্বদেশভাবনা ও আন্তর্জাতিকতাকে এক সূত্রে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথ 'কলাভবন'-এর শিক্ষকতা ও পরিচালনার উপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করেননি। তবে সামগ্রিকভাবে বিশ্বভারতীর মূল আদর্শ এবং নীতি তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। দেশের শিল্পীদের তিনি স্বদেশের অতুলনীয় সম্পদের মর্মরহস্য উপলব্ধি এবং আত্মস্থ করা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের ঐশ্বর্যকেও উপলব্ধি ও আত্মস্থ করে নিজস্ব রীতিতে সৃষ্টি ও উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন (নেপাল, ১৪০২ : ৮৬)।

রবীন্দ্রনাথের এই সংকীর্ণতামুক্ত দেশজ ভাবনার প্রভাব পড়ে নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬) এবং ব্যাপকভাবে রামকিঙ্কর বেইজের (১৯১০-১৯৮০) উপর। তাঁর স্বদেশ ভাবনার অন্তরে যে লোকজীবন, সাধারণ আটপৌরে প্রান্তিক মানুষের উপস্থিতি ছিল তা শিল্পীদের শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও নব্যবঙ্গীয় শিল্পের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে লৌকিকতা, লোকশিল্পের সারল্য এবং পাশ্চাত্য প্রতিচ্ছায়াবাদ (ইম্প্রেশনিজম), সম্প্রকাশবাদ (এক্সপ্রেশনিজম), ও ঘনকবাদী (কিউবিস্ট) রীতির নিরীক্ষাধর্মিতার প্রকাশ ঘটেছিল বেশ কিছু শিল্পীর শিল্পকর্মে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২), গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮), অমৃতা শেরগিল (১৯১৩-১৯৪১) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)।

দুর্ভিক্ষ চিত্র-১৩, কালি ও তুলি, ১৯৪৩
জয়নুল আবেদিন

চিত্রকলার এ রকম একটি পরিপ্রেক্ষিতেই জয়নুল আবেদিন অবিভক্ত ভারতের তৎকালীন পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) ময়মনসিংহ থেকে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ১৯৩২ সালে।

ছাত্রজীবনে তাঁর ছবির বিষয় ছিল প্রকৃতি ও মানুষ। কলকাতা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রচুর স্কেচ করতেন। এছাড়াও সাঁওতাল পরগনার দুমকার প্রকৃতি ও আদিবাসী এবং ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা নিয়ে স্কেচ করেছেন (আজিজুল, ২০০৪ : ১৪)। টেকনিক হিসেবে একাডেমিক রিয়েলিজমের সাথে তাঁর ছবিতে মিশেছিল প্রতিচ্ছায়াবাদী ও সম্প্রকাশবাদী রীতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চীন-জাপানের শৈলী। ছাত্রজীবন থেকেই জয়নুলের ছবিতে ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত স্বভাবনিষ্ঠতা — যার মূলে ছিল সংবেদনশীল এক গভীর ঐহিকতাবোধ (শোভন, ১৪০২ : ৯৫)। আর এই ঐহিকতাবোধের সঙ্গে মিশেছিল নিজের দেশের মাটির প্রতি টান। সম্ভবত এই মাটির টানের প্রণোদনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁর শিক্ষক মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫-১৯৯১) ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর (১৯০২-১৯৫৫) পদ্মানদী ও বাংলার গ্রাম জনপদকে বিষয় হিসেবে নিয়ে করা এচিং থেকে যা জয়নুল প্রত্যক্ষ করেছেন তার ছাত্রজীবনে (শোভন, ১৪০২ : ৯৪)। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের স্কেচগুলো জয়নুল আবেদিনের ছবি আঁকার ধরনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। জয়নুল তাঁর স্বভাবনিষ্ঠ দৃশ্যাবলি অঙ্কন থেকে দুর্ভিক্ষের ছবিতে বাস্তবনিষ্ঠতার দিকে সরে আসেন (শোভন, ১৪০২ : ১০৭)। মানব শরীরের সরলীকৃত এবং দীর্ঘায়িত রূপ, আলোছায়াহীন কঠিন, কর্কশ রেখা, দৃশ্যপট থেকে শুধু ফিগারকে তুলে এনে ফাঁকা পটভূমিতে বিন্যস্ত করা— সবকিছুর মধ্য দিয়ে মানুষের করুণ অবস্থা এবং বাঁচার আকুতিকে অভিব্যক্তিপূর্ণ বাস্তববাদিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন জয়নুল। শোভন সোম জয়নুলের ছবির এই বাস্তবধর্মিতার একটি ব্যাখ্যা দেন এভাবে :

> গ্রামবাংলার সাধারণ মুসলমান পরিবারের সন্তান জয়নুলের মধ্যে ধর্মীয় কাব্য পুরান-অতিকথার দায় ছিল না, ছিল না আভিজাত্যের ইতর ভেদের ব্যাপার। ... ঘরের পরিচয়, মাটির সংরাগ ছেড়ে তিনি ভৌগোলিক দূরত্বে অতীতের ধূসরতায় তাঁর আত্মাকে খোঁজেন নি। তাঁর ছবিতে যা প্রকাশিত হয়েছে তা হল আবহমান বাঙলা। (শোভন, ১৪০২ : ১১৯)

এ কারণে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রান্তিক মানুষ যখন খাদ্যের অভাবে শহরের রাস্তায় ভিড় জমায়, ক্ষুধায় মারা যায় — তখন জয়নুলের মনে গভীর দাগ কাটে। বাংলার সাধারণ মানুষের এ করুণ দশা তাঁর চিত্রপটে করুণ রসে মূর্ত হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশের দশকে জয়নুল আবেদিনের ছবিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ শিল্পী একটি শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) চলে আসেন। এ সময়ে জয়নুল আবেদিনের করা ছবির বিষয়ভাবনা ও উপস্থাপন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মূল সুরের কাছাকাছি ছিল।

জয়নুল আবেদিন, *গুণটানা*, গোয়াশ, ১৯৫৩

'১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড ও পূর্ববাংলার ঔপনিবেশীকরণের প্রেক্ষিতে বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা নবরূপে প্রবল শক্তি নিয়ে স্ফুরিত হয়। ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ভাষাভিত্তিক বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারায় দেখা যায় যে, পূর্ব বাংলার বাঙালীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদির অনুসন্ধান ও চর্চা শুরু হয়েছে ইতিহাসে, গবেষণায়, সাহিত্যে এবং সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গনে। পূর্ববাংলার জনগণের স্বাজাত্য ও স্বকীয়তা বিকশিত হয় এবং শেকড়ের সাথে যোগসূত্র তৈরি হয় এ প্রক্রিয়ায়' (হাসান, ১৯৯২ : ৩০)। সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হিসেবে চিত্রকলা চর্চাতেও ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ততা ও স্বাজাত্যভাবনার প্রকাশ ঘটে। এ প্রকাশ শুধু ছবির বিষয়ভাবনায় সীমাবদ্ধ ছিল না, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আঙ্গিকের নতুন উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে চিত্রকলা চর্চার ক্ষেত্রে নিজস্ব আধুনিক চিত্রভাষা নির্মিত হয়। পঞ্চাশের দশকে করা জয়নুল আবেদিনের কয়েকটি ছবি বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তাঁর করা *আয়নাসহ বধূ* (তেল রং, ১৯৫৩), *দুই মহিলা* (গোয়াশ, ১৯৫৩), *পাইন্যার মা* (গোয়াশ, ১৯৫৩), *গ্রাম্য মহিলা* (জলরং, ১৯৫৩), *কৃষক* (জলরং, ১৯৫৩), *গুণটানা* (গোয়াশ ১৯৫৩) — এ ছবিগুলিতে গ্রামের প্রান্তিক মানুষ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। ছবি সম্পাদনের ক্ষেত্রে রূপ বা গড়নের সরলীকরণ, সমতলীয় রঙের প্রয়োগ, বহিঃরেখার ব্যবহার, অলংকারধর্মিতা প্রভৃতি লোকশিল্পের রীতি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতির সংশ্লেষ ঘটেছে। 'একই চিত্রে লোকশিল্পের অন্তর্গত ময়মনসিংহের হাতে-টেপা পুতুলের দীর্ঘ গলার প্রভাব যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি পাশাপাশি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ঘনকবাদী শিল্পীদের জ্যামিতিক ফর্মে অবয়ব বিন্যাসের কৌশলও' (আজিজুল,

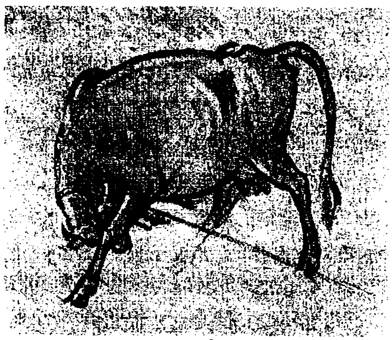

জয়নুল আবেদিন, *বিদ্রোহী গরু*, জলরং, ১৯৫১

২০০৪ : ১৯)। তাঁর *বিদ্রোহী গরু* (জলরং, ১৯৫১), *মই দেয়া* (জলরং, ১৯৫১), *কালবৈশাখী* (জলরং, ১৯৫১), *গুণটানা* (গোয়াশ, ১৯৫৩), *সংগ্রাম* (তেলরং ও টেমপারা, ১৯৫৯) প্রভৃতি ছবিগুলোতে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অভিযান বা বাধাপ্রাপ্ত গতি এবং এই বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যক্ত হয়েছে। সংগ্রামী জীবনের প্রতীকী ব্যঞ্জনা এই ছবিগুলিতে রয়েছে। ১৯৭০ সালে জয়নুল আবেদিনের করা দুটি স্ক্রলচিত্র *নবান্ন* (মোম, কালি ও জলরং)-এ আবহমান বাংলার মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতি এবং *মনপুরা ৭০* (কালি ও মোম)-এ তাদের বিপর্যয় ও জেগে ওঠার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। *নবান্ন* ছবিটিতে সমগ্র গ্রামীণ জীবনপ্রবাহ উঠে এসেছে। শ্রম, আনন্দ, কষ্ট, সংগ্রাম— জীবনের সব উপাদানই এখানে আছে। কৃষকের ফসল ফলানো, ফসল ঘরে তোলা, উৎসব, মাঝির গুণটানা, দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামের মানুষের শহর অভিমুখে যাত্রা— এ ঘটনাগুলো আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়বাহী। আমাদের জাতিসত্তাকে অখণ্ডরূপে প্রতীকায়িত করা হয়েছে এই স্ক্রল চিত্রটিতে। স্বাজাত্যবোধ ছাড়াও জয়নুল আবেদিনের লোকঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ জাগ্রত হওয়ার পেছনে আর একটি কারণ হলো বিদেশ ভ্রমণ। ১৯৫১ সালের আগস্ট থেকে ১৯৫২-র আগস্ট পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও উচ্চশিক্ষা তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত ও ঐতিহ্য সচেতনতাকে বৃদ্ধি করে। কামরুল হাসানের একটি উক্তি এর প্রমাণ। কামরুল হাসান তাঁর *আমার কথা : বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন* প্রবন্ধে লিখেছেন :

জয়নুল আবেদিন, *দুই মহিলা*, গোয়াশ, ১৯৫৩

> শিল্পী জয়নুল আবেদিন যখন বিদেশ থেকে ফিরে বাংলার পটুয়া শিল্পীদের চিত্রকলার বিদেশে কী মর্যাদা এবং এটাই আমাদের চিত্রকলার আসল পরিচয় বলে আখ্যায়িত করলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি আমার ব্রতচারী-শিবিরে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আবার নতুন করে আঁকড়ে ধরেছি। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৫২ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৯৫৩ সালের বেশ কিছুদিন একটি সংমিশ্রিত পদ্ধতিতে অনেক ছবির খসড়া এঁকেছিলেন শিল্পী আবেদিন। (কামরুল, ২০১০ : ৩৬)

১৯৫৫ সালের আগস্টে জয়নুলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদেশের প্রথম লোকশিল্প প্রদর্শনী। (শাওন, ২০০৯ : ২২) বাংলার লোকশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে তুলে ধরাই ছিল এ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

কামরুল হাসানের জন্ম কলকাতায়। কলকাতা শহরে বেড়ে ওঠা কামরুল হাসান কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ১৯৩৮ সালে। ১৯৩৯ সালে তিনি গুরুসদয় দত্তের

(১৮৮২-১৯৪১) ব্রতচারী আন্দোলনে যোগ দেন। বাঙালি সংস্কৃতি এবং শুদ্ধ জাতীয়তাবাদ প্রত্যেক বাঙালির জীবনগঠনে স্বকীয়তা রক্ষা করবে এটাই ছিল ব্রতচারী আন্দোলনের মূল নীতি (আজিজুল, ১৯৯৮ : ৪১)। ব্রতচারী আন্দোলনে যোগদান কামরুল হাসানকে বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। বিশেষ করে পটুয়া শিল্পীদের অঙ্কন শৈলী কামরুলের শিল্প রচনা এবং শিল্পীমানস গঠনে স্থায়ী ছাপ ফেলে (আজিজুল, ১৯৯৮ : ৪২)। মূলত লোককলায় অবগাহনের মধ্য দিয়েই কামরুল হাসানের শিল্পবৈশিষ্ট্যে স্বদেশানুরাগের জন্ম। (আজিজুল, ২০০৩ : ২৫)

কামরুল হাসানের রাজনৈতিক চেতনা তাঁর স্বদেশচেতনার সমান্তরালে প্রবহমান ছিল। চল্লিশের দশকে ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সংযুক্তি, ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ এবং গণনাট্য আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে যুক্ততা, সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের পুস্তিকা সম্পাদনা প্রভৃতি সূত্রে তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠেছিল (আজিজুল, ২০০৩ : ২৫)। চল্লিশের দশকে 'ভীমরুল' ছদ্মনামে *মিল্লাত*, *আলোড়ন*, *কমরেড* প্রভৃতি পত্রিকায় অঙ্কিত তাঁর কার্টুনগুলিতে রাজনৈতিক ব্যঙ্গবিদ্রূপ সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ পেয়েছে (আজিজুল, ২০০৩ : ২৬)। 'চল্লিশের দশকের এই রাজনৈতিক সচেতনতা কামরুল হাসানের মধ্যে আমৃত্যু শুধু অক্ষুণ্ণই ছিল না, ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে যেসব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে সেসবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ১৯৫১-র চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন ও কুমিল্লার সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ১৯৫৪-র ঢাকা সাংস্কৃতিক সম্মেলন, ১৯৫৭-র কাগমারি সম্মেলন প্রভৃতিতে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ষাটের দশকে বাংলা বর্ণমালা শোভিত শাড়ির নকশায় বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় তুলে ধরা, ১৯৬৯-এ 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ'-এর ব্যানারে গণজাগরণে যোগদান ও বাংলা একাডেমীতে অক্ষরবৃক্ষের উদ্বোধন এবং সবশেষে ১৯৭১-এর মার্চ মাসের অসহযোগে অংশগ্রহণসহ মুক্তিযুদ্ধের বিপুল কর্মযজ্ঞে আত্মনিবেদনার্থে কলকাতা গমনের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক বোধের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে' (আজিজুল, ২০০৩ : ২৬)। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমীর বটবৃক্ষে অক্ষরবৃক্ষের নির্মাণকে এদেশে স্থাপনা শিল্প (Installation art) সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস বলা যেতে পারে যেখানে শিল্প সরাসরিভাবে সাধারণ মানুষকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কামরুল হাসান, *অক্ষরবৃক্ষ*, ১৯৬৯

কামরুল হাসান, *গরুর স্নান*, জলরং, ১৯৬৭

কামরুল হাসানের ছবির বিষয় ছিল অতি সাধারণ গ্রামীণ মানুষ এবং তার পরিবেশ — নদী, নৌকা, মাছধরা, কলসী নিয়ে গ্রামের নারীর পানি আনতে যাওয়া, বাউল, বংশীবাদক, ঘোমটায় ঢাকা বধূ, গ্রামের বধূর বাবার বাড়িতে যাওয়া, ফসল মাথায় কৃষক, গুনটানা, গরুর গাড়ি, গরু, জেলে, মোরগ, মা ও শিশু, পাখি, বক, গ্রামীণ নিসর্গ, ফুল লতাপাতা, মাছ, ফসলের ক্ষেত, কলাগাছ, শেয়াল, কুমির, সাপ, পেঁচা, পাখিওয়ালা প্রভৃতি। এ বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পরিচয়টিই একান্তভাবে পরিস্ফুট হয় (আজিজুল, ২০০৩ : ২৫)। নকশি কাঁথা, সরাচিত্র, পটচিত্র, সখের হাঁড়ি, পুতুল প্রভৃতি শিল্পের গড়ন, নকশা, মোটিফ, তুলিচালনা কৌশল, মৌলিক রং ব্যবহার, দ্বিমাত্রিক ফর্ম, সমতলীয় বর্ণলেপন, অলংকারধর্মিতা প্রভৃতি রীতি কৌশল কামরুল হাসান তাঁর চিত্রে ব্যবহার করেন। লক্ষ্মীসরা বা সখের হাঁড়ির চিত্রে যেভাবে তুলির দ্রুত সঞ্চালনে ভলিউমসমৃদ্ধ রূপ সৃষ্টি করা হয় সেই প্রক্রিয়াতেই কামরুল হাসান চিত্রে রূপ সৃষ্টি করেন। লোকচিত্রে ছবির পটভূমি প্রায়শ একটি রঙের সমতলীয় প্রলেপে চিত্রিত। কামরুলের অনেক ছবির পটভূমি এভাবেই তৈরী, কখনও কখনও মূল বিষয়ের পরিপার্শ্ব অলংকৃত করা হয়েছে তুলির আঁচড়ে। তাঁর অনেক চিত্রে সম্প্রকাশবাদী বা ঘনকবাদী রীতির সঙ্গে লোকরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। লোকচিত্রের মৌলিক রং তাঁর ছবিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তাঁর *তিনকন্যা* চিত্রে নীল, হলুদ আর লালের ব্যবহার এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। *তিনকন্যা* সম্পর্কে শোভন সোম লিখেছেন :

তিনকন্যা-১, তেলরং, ১৯৫৫
কামরুল হাসান

কামরুলের এই তিনকন্যার অঙ্গভঙ্গিতে, সলজ্জ অথচ অপার বিস্ময় মাখা দৃষ্টিতে, তাদের শাড়ি পরার, কলসি ধরার মধ্যে আদ্যন্ত বাঙালিয়ানা প্রতিফলিত। তাদের বাংলার সঙ্গে আইডেন্‌টিফাই বা চিহ্নিত করা যায়। যেভাবে সারা গা ঢেকে ওরা শাড়ি জড়িয়ে রয়েছে, মুখে আঁচল চাপা দিয়েছে, ঝোপঝাড়ে দাঁড়িয়ে আছে গায়ে গা ঘেঁষে, তা একমাত্র বাংলাদেশেই দেখা যায়। (শোভন, ১৪১২ : ১০৭)

কামরুল হাসানের চিত্রে যামিনী রায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর প্রভাব দেখা যায় (আজিজুল, ২০০৩ : ২৪)। যামিনী রায়ের রাধাকৃষ্ণ লীলা, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী, বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র বা বৈষ্ণব ভাবরসে অঙ্কিত বিষয়বস্তুর চিত্রণ পটচিত্রের চেয়ে মন্দির অলংকরণের গুণাগুণ দ্বারা বেশি প্রভাবিত (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮০: ১৭)। মন্দিরের গায়ে রিলিফ ভাস্কর্যের ফুলকারী নকশা, সামাজিক ও পৌরাণিক মূর্তি বিন্যাস রীতি, অনমনীয় ভাব ও ঘনত্ব যামিনী রায়ের ছবির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮০ : ১৮)। কামরুল হাসানের ছবিতে ধর্মীয় ভাব অনুপস্থিত। তাঁর ছবির ফর্ম, তুলির টান, ফর্মের বিন্যাস অনেক স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল। ঐতিহ্য চেতনা, লোকচিত্রের উপাদান এবং পাশ্চাত্য রীতির সংমিশ্রণের সাথে আর একটি বৈশিষ্ট্য কামরুল হাসানের ছবিকে আধুনিক করেছে। সেটি হলো, সমসাময়িক জীবনাভিজ্ঞতা তিনি সুচিন্তিতভাবে তাঁর চিত্রে প্রকাশ করেছেন। নান্দনিক চেতনা এবং ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সাথে সাথে তাঁর চিত্রে তিনি জাতীয় পরিচয় নির্মাণ, ঔপনিবেশিকতা এবং শোষণের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

কামরুল হাসানের স্বাজাত্যবোধ, তাঁর ছবির বিষয় এবং লোক-আঙ্গিকের ব্যবহার, এ সবের একটি বিশ্লেষণমূলক এবং তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। তাঁর মতে :

কামরুল হাসানের কাজে সোনার বাংলার নস্টালজিয়া সংক্রমিত হয়েছে, বাংলার অতীতের একটি নির্বাচিত পর্ব চোখে উদ্ভাসিত হয়েছে : ঐ নির্বাচিত পর্ব সমকালের গ্রামীণ ঘরবাড়ি, প্যাস্টারল সমাজের মধ্যে নিহিত, বাংলা সাহিত্য এবং সঙ্গীতের মধ্যে ক্রিয়াশীল, এভাবে তৈরী হয়েছে সোনার বাংলার কিংবদন্তী, পাকিস্তানের সামাজিক ঔপনিবেশিক বর্তমান ছাড়িয়ে, দারিদ্র-জর্জরিত বাংলার আদিমতার দিকে। এভাবেই ইতিহাসের একটি পর্ব, গ্রামীণ প্যাস্টারল ব্যবস্থা, আদিমতার নস্টালজিয়া মিলে তৈরি হয়েছে সোনার বাংলার মিথ; কামরুল হাসান তাঁর কাজে এই মিথের বিভিন্ন উপাদান এবং বিশেষত্বকে ব্যবহার করেছেন একটি সাংস্কৃতিক পরিসর নির্মাণের জন্য।

তাঁর এই সাংস্কৃতিক পরিসর নির্মাণে ক্রিয়াশীল দুটি উপাদান : সেক্যুলার বোধ এবং কম্যুনিটি বোধ। সেক্যুলার বোধে তিনি উপনীত হয়েছেন সাবেক পাকিস্তান এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক গঠন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে, এবং পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্মাণ করেছেন সাংস্কৃতিক গঠন। (বোরহান, ১৯৯১ : ১৮)

কলকাতা শহরে বেড়ে ওঠা সফিউদ্দীন আহমেদ ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে ছাপছবির দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী। তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ১৯৩৬ সালে। তাঁর শিক্ষক মুকুলচন্দ্র দের প্রেরণায় ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহায়তায় তিনি স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মকে

অতিক্রম করেছিলেন। যার প্রকাশ দেখা যায় ১৯৪১এর পর থেকে করা তাঁর ছাপাই ছবিতে। *ঘরে ফেরা* (উড এনগ্রেভিং, ১৯৪৫), *দুমকা* (ড্রাই পয়েন্ট, ১৯৪৫), *মেলার পথে* (উড এনগ্রেভিং ১৯৪৬), *সাঁওতাল রমণী* (উড এনগ্রেভিং, ১৯৪৬), *শান্তিনিকেতনের দৃশ্যপট* (ড্রাই পয়েন্ট, ১৯৪৬) প্রভৃতি ছবি 'গ্রাম্য পরিবেশে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের ছবি' (শোভন, ১৪০৬: ৫৯)। প্রকৃতির মাঝে মানুষ, পশু এবং পশুচালিত গাড়ির চলমান দৃশ্য ছবিগুলিতে গতিশীলতা আরোপ করেছে। এই পর্বে সফিউদ্দীনের তেল রঙে আঁকা *সূর্যালোকে কুটির* (১৯৪৬), *দুমকা-১* (১৯৪৬), *দুমকা-২* (১৯৪৬), *শালবন দুমকা* (১৯৪৬) ইত্যাদি ছবিগুলি অ্যাকাডেমিক স্বভাববাদী রীতির পরিবর্তে প্রতিচ্ছায়াবাদী রীতিতে করা হয়েছে। এভাবে এ পর্যায় থেকেই সফিউদ্দীন আহমেদ বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ না করে বাস্তবের পুনর্বিন্যাস করেছেন।

গুনটানা-৩, কালি ও তুলি, ১৯৫১
সফিউদ্দীন আহমেদ

সফিউদ্দীন আহমেদ, *কাঠমিস্ত্রি*, তেলরং, ১৯৫৬

দেশবিভাগের পর ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁর ছবিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। এ সময় তাঁর ছবিতে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের শরীর প্রায় পুরো চিত্রপট জুড়ে আঁকা হয়েছে এবং রেখার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর *মাছধরা* (তেলরং, ১৯৫৪), *কাঠমিস্ত্রি* (তেলরং, ১৯৫৬) ছবি দুটিতে সমতলীয় রং এবং বহিঃরেখার ব্যবহার রয়েছে। *ধানঝাড়া* (তেলরং, ১৯৫৬) ছবিটিতে রোদে পোড়া শরীরে কৃষকের ধান মাড়াইয়ের দৃশ্য বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতির পরিচায়ক। ১৯৫০ সালে কালি-কলম ও তুলিতে আঁকা *গুনটানা-১*, *মাছধরা-১*, *দম্পতি*, *বেহালাবাদকসহ ছাদপেটানো-১* এবং ১৯৫১ সালে কালি ও তুলিতে

আঁকা *গুনটানা-৩* প্রভৃতি রেখানির্ভর ছবিগুলিতে নকশাধর্মিতা এবং লোকশিল্পের গুণাগুণ উপস্থিত। *গুণটানা-৩* ড্রইংটিতে মৃৎপুতুলের আদলে মানুষের শরীরের কাঠামো আঁকা হয়েছে। কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসার পর তাঁর ছবি আঁকার ধরনে এই পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চাশের দশকে ঢাকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল হয়তো তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

সফিউদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশে আসার পর এখানকার জলবায়ু, পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষকে ছবির বিষয় করে ক্রমাগত আঙ্গিকের নিরীক্ষাধর্মিতার দিকে অগ্রসর হন। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় তিনি প্রথম বন্যা প্রত্যক্ষ করেন। এই অভিজ্ঞতার পর জল এবং জলকেন্দ্রিক জীবন তাঁর ছবির বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বন্যা, মাছ, মাছধরার জাল, নৌকা, গুনটানা, সেতু, বন্যায় বিপর্যস্ত জীবন — তাঁর ছবিতে পৌনঃপুনিক বিষয় হয়েছে। ১৯৫৬-১৯৫৮ সালে ইউরোপে ছাপচিত্রের উপর প্রাপ্ত শিক্ষা তাঁর ছবির আঙ্গিকের নিরীক্ষাধর্মিতাকে আরো সমৃদ্ধ করে। *হলুদ জাল* (এনগ্রেভিং সফটগ্রাউন্ড, ১৯৫৭), *মাছ ধরার সময়* (এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৫৭), *কম্পোজিশন* (এনগ্রেভিং এ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৫৮), *গুনটানা* (এনগ্রেভিং ১৯৫৮), *বন্যা* (অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৫৯), *নেমে যাওয়া বান* (সফটগ্রাউন্ড অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৫৯), *সেতু পারাপার* (এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৫৯), *মাছ ধরার জাল* (এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৬৪), *বিক্ষুব্ধ মাছ* (এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৬৪), *নীল জল* (এচিং অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৬৪) প্রভৃতি ছবি তিনি বিমূর্ত আঙ্গিকে করেছেন। বাঁকা রেখা, বিশেষ করে উত্তল ও অবতল রেখার বিন্যাসে ছবির পটভূমিকে বিভাজিত করেছেন। রেখাগুলোতে গতি রয়েছে যা একই সঙ্গে দৃষ্টিকে ছবির কেন্দ্রে নিয়ে যায় এবং কেন্দ্রের বাইরে প্রসারিত করে। রঙের ঘনত্বের তারতম্য এবং উষ্ণ ও শীতল রং ব্যবহারের কারণে ছবিতে গভীরতার বোধ তৈরী হয়েছে। তবে সফিউদ্দীনের এই রেখানির্ভর বিমূর্ত ছবিগুলির বিশেষত্ব হলো, তা বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করে। নৌকা, মাছ, চোখ, জাল, নদীর বাঁক, জলের তরঙ্গ এসবের আকৃতি থেকেই মূলত তিনি বঙ্কিম রেখা চয়ন করে ছবির ক্ষেত্র বিভাজিত করেছেন যা একই সঙ্গে বিমূর্ত হয়েও বাংলার নদীমাতৃক প্রকৃতির রূপকল্প সৃষ্টি করেছে।

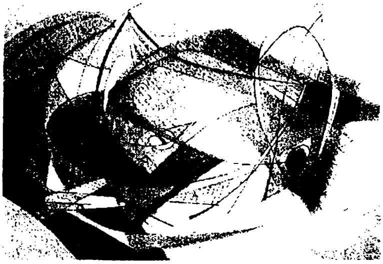

হলুদ জাল, এনগ্রেভিং সফটগ্রাউন্ড, ১৯৫৭,
সফিউদ্দীন আহমেদ

চল্লিশের দশকের আর এক শিল্পী শেখ মোহাম্মদ সুলতান কলকাতায় শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন একেবারেই নিম্নবর্গীয় মানুষের মধ্য থেকে। ১৯৪১ সালে সুলতান কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৪৪ সালে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। এরপর সুলতান কাশ্মীর, লাহোর, করাচি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে ১৯৫৩ সালে চলে আসেন তাঁর জন্মভূমি নড়াইলে। মাটির টান, জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা সুলতানের ছবিতে প্রবল। তবে তার প্রকাশ জয়নুল আবেদিন বা কামরুল হাসানের মত নয়। একেবারেই স্বতন্ত্র একটি চিত্রভাষা নির্মাণ করেছেন

সুলতান। নিসর্গ সুলতানের একটি প্রিয় বিষয়। অনেক নিসর্গের দৃশ্যই তিনি এঁকেছেন স্মৃতি থেকে। তাঁর বেশিরভাগ চিত্রের বিষয় মানুষ — কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। নিম্নবর্গীয় থেকে উঠে আসা সুলতান নিজের সত্তা খুঁজে ফিরেছেন এদের মাঝে। এই নিম্নবর্গীয় মানুষকে সুলতান ক্যানভাসে উপস্থাপন করতে গিয়ে স্বতন্ত্র একটি ভাষা সৃষ্টি করেছেন। দেশীয় উপকরণে বিশাল ক্যানভাস জুড়ে সুলতানের কৃষকদের এঁকেছেন পেশীবহুল দেহের অধিকারী করে। গ্রামীণ প্রকৃতির মাঝে কর্মরত অসংখ্য ফিগারের একটি জটিল বিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ক্যানভাসে। এ জটিলতায় বৈপরীত্য এসেছে চিত্রণের কৌশল থেকে। তাঁর ছবি বাস্তব জগতের প্রকাশ কিন্তু স্বভাববাদী রীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় নয়। কোনো একাডেমিক রীতিকেই তিনি অনুসরণ করেননি। অসংখ্য বর্তুলাকার রেখা দ্বারা তৈরি তার পেশীবহুল ফিগারগুলো প্রায় অভিন্ন চেহারার। আলো, ছায়া কিংবা রঙের ভলিউম দূরত্বের এবং তিন মাত্রার বোধ তৈরীতে ব্যর্থ হয়েছে। একধরনের আদিম এবং শিশুসুলভ সরলতা তাঁর ছবিতে স্পষ্ট। এ গুণগুলো তাঁর ছবির জগৎকে বাস্তব থেকে একটু দূরে নিয়ে যায়। সুলতানের বিষয় নির্বাচন এবং উপস্থাপনের একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় এভাবে —

সেইন্ট, জলরং, ১৯৫৩
এস.এম. সুলতান

'সুলতান প্রত্যাখ্যান করেছে পশ্চিমের আধুনিকতা, প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তানের কলোনীর আধুনিকতা, সুলতান বার বার ফিরে গিয়েছে তাঁর শিকড়ে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, পাকিস্তান ফেরত সুলতানের বক্তব্য হচ্ছে ঃ অধস্তন বিশ্বের শিল্পীরা কেবল এথনিক শিল্পী নয়, তাঁরা প্রান্তিক অভিজ্ঞতার প্রবক্তা কেবল নয়, যে অভিজ্ঞতা অতীতের মধ্যে আবদ্ধ, আধুনিকতা থেকে দূরে। অধস্তনদের অভিজ্ঞতা ঔপনিবেশিকতা, পরাধীনতা এবং দাসত্বের কারণে জটিল, স্বতন্ত্র এবং অনন্য, এই অভিজ্ঞতা জনসমষ্টিকে একটি স্বতন্ত্র কণ্ঠে এবং চোখে বলবার, দেখবার, ভাববার ক্ষমতা প্রদান করেছে। এই কণ্ঠ এবং চোখ আধুনিকতার উৎপাদন থেকে বহির্ভূত নয়। এ হচ্ছে অন্য এক আধুনিকতা। এ হচ্ছে

চর দখল-২, তেলরং, ১৯৮৬
এস.এম. সুলতান

দেশজ আধুনিকতা, এ হচ্ছে কৃষকদের অভিজ্ঞতা, এ হচ্ছে আউল-বাউল ফকিরদের গীতের অভিজ্ঞতা, এ হচ্ছে অধস্তন লাঞ্ছিত পরাজিত কৃষক-আউল-বাউল ফকিরদের প্রতিরোধের অভিজ্ঞতা। প্রাত্যহিক জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা আধুনিকতা নামক ক্ষমতা সম্পর্কের মধ্যে ভিন্ন এক চয়ন এবং বুনন। এই চয়ন এবং বুনন থেকে তৈরী হয় দেশজ আধুনিকতা'। (বোরহান, ১৯৯৯ : ১৪)

এভাবে এ চার শিল্পী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্বের আধুনিকতার ঐতিহ্য থেকে মুক্ত, পাকিস্তান পর্বে প্রতিরোধে সক্রিয়, নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়বাহী একটি নতুন চিত্রভাষা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, যাকে চিহ্নিত করা যায় বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা চর্চার প্রথম পর্যায় হিসেবে।

গ্রন্থপঞ্জি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর. ১৯৮৫. "জোড়াসাঁকোর ধারে", *অবনীন্দ্র রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), ৩য় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন : কলকাতা।

কামরুল হাসান. ২০১০. *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা,* (সংগ্রহ ও সম্পাদনা : সৈয়দ আজিজুল হক), প্রথমা প্রকাশন : ঢাকা।

চণ্ডী লাহিড়ী. ২০০৪. *গগনেন্দ্রনাথ, কার্টুন ও স্কেচ,* সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

নেপাল মজুমদার. ১৪০২. "ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ", *পশ্চিমবঙ্গ,* অবনীন্দ্রসংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ : কলকাতা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর. ১৯৯১. *কামরুল হাসান,* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী : ঢাকা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর. ১৯৯৯. *দেশজ আধুনিকতা: সুলতানের কাজ,* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী : ঢাকা।

মৃণাল ঘোষ. ২০০৫. *বিংশ শতাব্দীর ভারতের চিত্রকলা ও আধুনিকতার বিবর্তন,* প্রতিক্ষণ : কলকাতা।

মৃণাল ঘোষ. ২০০৮. *বিশ্বায়ন ও অন্যান্য শিল্প প্রসঙ্গ,* প্রতিক্ষণ : কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত. ১৯৮০. "যামিনী রায় বাঁকুড়া", *শিল্পী মানুষ যামিনী রায়,* (সংকলন রচনা অনুবাদ সম্পাদনা. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত,সুমনা চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মাজি) পুস্তক বিপণি : কলকাতা।

শোভন সোম. ১৪০২. "জয়নুল আবেদিন", *নিরন্তর,* চতুর্থ সংখ্যা, বর্ষা সংকলন, শ্রাবণ, ঢাকা।

শোভন সোম. ১৪০৬. "সফিউদ্দীন আহমেদের চিত্রকলা", *নিরন্তর,* পঞ্চম সংখ্যা, বসন্ত সংকলন, ফাল্গুন, ঢাকা।

শোভন সোম. ১৪১২. "কামরুল হাসান : রঙে রূপে রেখায়" *নিরন্তর,* ষষ্ঠ সংখ্যা, শীত সংকলন, পৌষ, ঢাকা।

শাওন আকন্দ. ২০০৯. "একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা", *শিল্পরূপ,* তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ঢাকা।

সুপ্রকাশ রায়. ১৯৮৩. *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম (১৮৯৩-১৯৪৭)* (দ্বিতীয় সংস্করণ), র‍্যাডিক্যাল : কলকাতা।

হাসানউজ্জামান. ১৯৯২. *বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম,* পল্লব পাবলিশার্স : ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক. ১৯৯৮. *কামরুল হাসান : জীবন ও কর্ম,* বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক. ২০০৩. *কামরুল হাসান,* Art of Bangladesh Series-3, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী : ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক. ২০০৪. *নিসর্গ ও মানবের গাথা, জয়নুল আবেদিনের চিত্রভুবন,* বেঙ্গল ফাউন্ডেশন : ঢাকা।

Ella Dutta. 2002. "Abanindranath Tagore, a new context", *Marg*, Vol. 53, No.3, Marg Publications : Mumbai.

Partha Mitter. 1994. *Art and Nationalism in Colonial India, 1850-1922, Occidental Orientations*, Cambridge University Press : Great Britain.

R. Siva Kumar. 2002. "Culture Specificity, art language, and the practice of modernism, an indian perspective", *Marg*, Vol. 53. No. 3, Marg Publications : Mumbai.